Vol. 1 | No. 1 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রূপপ্রতীকের ধারা

Volume	1
Issue	1
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অজিতকুমার গুহ
Published online	June 15, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.7
Pages	১৩৬-১৪২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রূপপ্রতীকের ধারা

Check for updates

অজিতকুমার গুহ

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

Online ISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 1
Number 1
Year 1957

সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা ১৩৬৪ (১৯৫৭)
বর্ষ: ১ সংখ্যা: ১ পৃষ্ঠা: ১৩৬-১৪২

DOI 10.62328/sp.v1i1.7

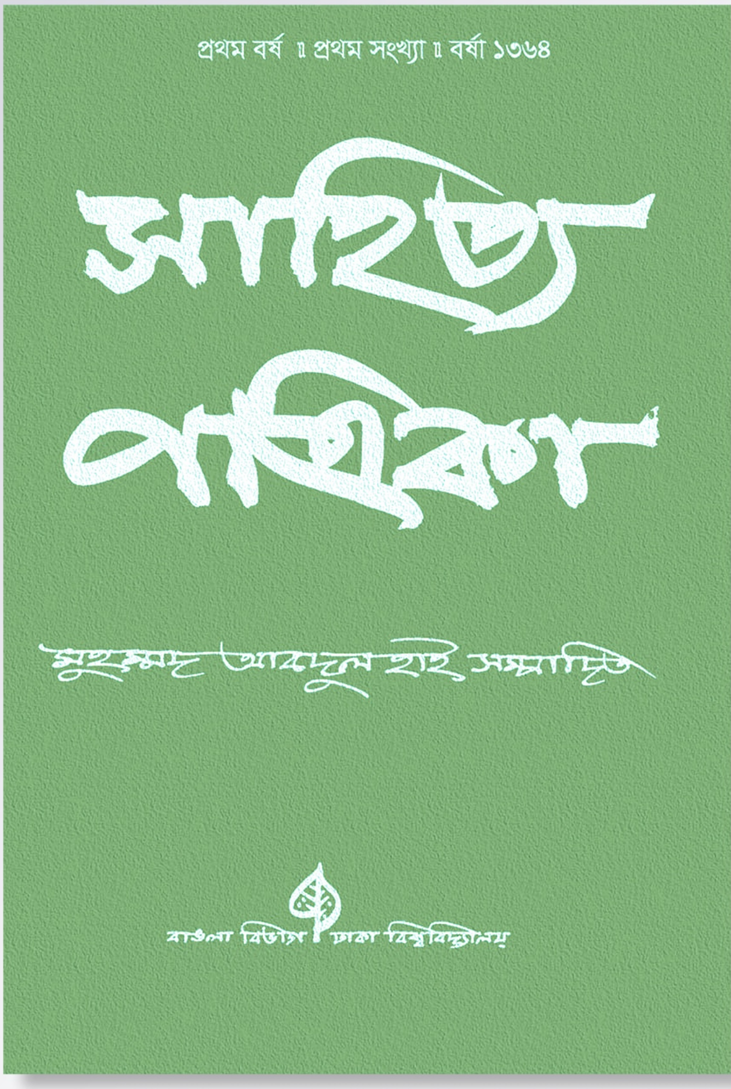

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রূপপ্রতীকের ধারা

অজিতকুমার গুহ*

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশকাব্যে যেখানে রাজা কপিলবর্ণের নন্দিনী গাভীকে নিয়ে দিনশেষে আশ্রমে ফিরে আছেন আর রাণী আশ্রম প্রাঙ্গনে তাঁকে অভ্যর্থনা কোরছেন,—রাজা ও রাণীর মধ্যবর্তী নন্দিনীর প্রতি তাকিয়ে কবির মন হঠাৎ বলে উঠলো—"দিনক্ষপামধ্যেগতৈবসন্ধ্যাঃ" — অর্থাৎ দিন ও রাত্রির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সন্ধ্যার মত। অপরাহ্নের অপরূপ দ্যুতিমান আকাশের নিচে এই একটি অতি পরিচিত সাধারণ ঘটনার মধ্যেও ব্যঞ্জনার এক অপরূপ সুর লাগলো। রাজার প্রদীপ্ত স্পষ্ট-প্রখর কান্তির সঙ্গে দিনের, রাণীর স্নিগ্ধ মাধুর্যের সঙ্গে রাত্রির আর পল্লবরাগভাম্রা নন্দিনী গাভীর সঙ্গে গোধূলির পিঙ্গলরশ্মিজাল-উদ্ভাসিত রূপের তুলনা উপমার দিক থেকে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু কবি এই প্রাত্যহিক সাংসারিক ঘটনার মধ্যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-পরিবেশ এমন করে মিলিয়ে দিয়েছেন যে সেই একটি সন্ধ্যা চিরদিনের মত আমাদের মানসলোকে দীপ্তি দিতে লাগলো, — একদিনের কয়েকটি মুহূর্ত অনন্ত গোধূলিতে পর্যবসিত হয়ে গেল। কবি যদি কেবলমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রের সীমিত উপকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন, জীবনসমুদ্রের ভাসমান ফেনপুঞ্জের বর্ণচ্ছটাই কেবল যদি তাঁকে মুগ্ধ কোরতো তাহ'লে এই প্রাত্যহিক তুচ্ছ ঘটনায় এত সহজভাবে আনন্দসৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনুভূতির যে অতল গভীরতায় কবির মন অবগাহন করেছে, রসাবেশের যে আবেগে তাঁর মন পরিপ্লুত তাই তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, খণ্ড, ও বিচ্ছিন্ন বস্তুতে জীবনের অখণ্ড রূপায়ণ ও আকাশের সীমাহীন বিস্তৃতি দিয়েছে।

কিন্তু এর পাশাপাশি 'মেঘদূতে'র প্রসিদ্ধ যক্ষপ্রিয়ার রূপবর্ণনাকে তুলনা করে দেখলে মনে হয় যে "তন্বীশ্যামাশিখরীদশনা'তে জীবনবোধের গভীরতার চাইতেও অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্ধ অনুস্মৃতি বেশী। প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সংযোগহীন প্রিয়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপমেয় বস্তুগুলোকে কবি তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যসৃষ্টির ঐতিহ্যের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন — নিজের চারিদিকের স্পন্দমান জীবনের নিয়ত চঞ্চল স্রোতাবেগের মধ্যে নয়।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.7

নারীদেহের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অভিনবগুপ্তবর্ণিত উপাদেয় বস্তু বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। প্রয়োগকৌশলে সেসব উপমা দক্ষ রূপসৃষ্টির সমাদর লাভ করে এসেছে সত্য, কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখলে তাদের নিকট সাদৃশ্য ও বৈচিত্রহীন পুনরাবৃত্তি বিস্ময়কর মনে হয়।

বস্তুতঃ আমাদের সাহিত্যে রূপপ্রতীকের এই ধারা তিনটি সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারার স্রষ্টারূপে দেখি শিক্ষিত কবিদের। পূর্বতন সাহিত্যের উত্তরাধিকার কবির উপকরণ ও আঙ্গিক সমৃদ্ধ করেছে। অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা কখনও বা তাঁদের রূপ বর্ণনাকে কৃত্রিম শিল্পচাতুর্যের কৌতূহলোদ্দীপক পথে টেনে নিয়েছে। ভারতচন্দ্রে ও ঈশ্বরগুপ্তে আমরা এর বহুল উদাহরণ দেখতে পাই। আবার কখনও দেখি জীবনবোধের স্পর্শে ও প্রয়োগকৌশলে পুরাতন ভাববস্তু নব নব রূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসে দেখি এই গভীর জীবনবোধ ও প্রকৃতির সঙ্গে তন্ময় একাত্মতা কবির উপমেয় বস্তুকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ কোরেছে। তাই কবি শকুন্তলার রূপ বর্ণনা কোরতে গিয়ে নায়িকার অধরকে নবীন কিশলয়ের রক্তাভার সঙ্গে, তার বাহু "কোমলবিটপানুকারিণী" বলেই ক্ষান্ত হননি; দেহের রূপবর্ণনার মধ্যপথে কবি আকস্মিকভাবে বোললেন — "হৃদয় লোভনীয়, কুসুম হেন"। শাস্ত্রানুগ রূপ- বর্ণনার বিধির তর্জ্জনীসঙ্কেত ও ভ্রূকুটীকুটিল দৃষ্টির প্রতি একটু মৃদু অবজ্ঞার হাসি হেসেই যেন কবি শকুন্তলার মধ্যে কেবল নারীর রূপঐশ্বর্য নয়, ছায়াস্নিগ্ধ সমস্ত তপোবনপ্রকৃতির পবিত্র মাধুর্যের রূপায়ন সার্থক করে তুলেছেন। কবিতায় যেমন যে শব্দ স্পষ্ট উচ্চারিত তার চাইতেও যা অনুচ্চারিত তাতেই ছন্দের প্রাণবস্তু প্রচ্ছন্ন থাকে অধিক, তেমনি কবি যেটুকু স্পষ্ট বর্ণনা করলেন তার চাইতেও তাঁর না-বলা বাণীর ব্যঞ্জনাই মনকে বেশী অভিভূত করে।

উপমারীতির দ্বিতীয় ধারার স্রষ্টা আমাদের লোকসাহিত্য ও পল্লীগীতিকার কবিগণ। এঁরা অনেকেই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। পূর্বতন সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কোন উত্তরাধিকার এঁদের নেই, পূর্বসূরীদের পদাঙ্কিত পথ এই পল্লী-কবিদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা; নেই তাঁদের শিল্পশাস্ত্রবর্ণিত আঙ্গিক ও উপকরণের লেশমাত্র পরিচয়; কিন্তু

জীবনবোধের অতল গভীর তরঙ্গস্পর্শে, অনুভূতির অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আপন প্রকৃতিপরিবেশ থেকেই তাঁরা উপমার বস্তু খুঁজে পেয়েছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপমার উপকরণ হয়তো তাতে নেই কিন্তু বাস্তব অনুভূতির স্পষ্টপ্রখর আবেগে তাঁদের রূপবর্ণনা যেন আরও স্পর্শময় রূপ লাভ করেছে। পাশাপাশি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বক্তব্য আর একটু বিস্তৃত করা যাক।

রাধার রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতি যখন বলেন—

"লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি তনু
কাজরে সাজল মদন ধনু॥"

তখন কি একথাই মনে হয় না যে সুন্দরীর নয়নযুগলের সঙ্গে ভ্রমরের ও তাঁর ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে মদনের ধনুর উপমা পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি তাঁর পূর্বতন সংস্কৃত সাহিত্যেই পেয়েছেন! অবশ্য প্রয়োগ-শিল্পের অপরূপ চাতুর্যে, ভাষা ও ছন্দের মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে — কবি অভিনব রসসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন তথাপি উপমার উপকরণের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর উপকরণ প্রাচীন সাহিত্যের সম্পদভাণ্ডার থেকেই গৃহীত এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এর পাশে পূর্ববঙ্গ গীতিকার "দেওয়ান ভাবনা"র "সুনাই"র বর্ণনায় দেখি, —

"আষাঢ় মাসে দীঘ্‌লা পানশীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে॥"

রূপযৌবনের এই বর্ণনায় প্রাচীন সাহিত্যের কোন অনুসৃতি নেই। যৌবনের পরিপূর্ণতার যে উপমা কবি দিয়েছেন তা পারিপার্শ্বিক জীবনের পরিবেশ থেকেই গৃহীত। কবি কেবল সুনাইর যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যের ছবিই আঁকেননি; সঙ্গে সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির পরিপূর্ণ তার পটভূমিকায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আকাশের চাঁদ বা বনের মৃগের অতিব্যবহৃত উপমা কবির কাছে নেই; কিন্তু জীবনের একান্ত নিকটসংলগ্ন স্নিগ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের বর্ষাবিস্ফারিত নদীটি, নদীবক্ষে তরঙ্গদোলায় দোদুল্যমান পানশীনৌকো, পরিপূর্ণ তার যে অনুভূতি কবির মনে সঞ্চার করেছে সুনাইর যৌবনের প্রতীক কবি তার মধ্যেই পেয়েছেন। তাই তার উপমায় কেবল নারীর

সৌন্দর্য নয়, সমগ্র পল্লীপ্রকৃতির জীবনের আবেগ স্পর্শময় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে লক্ষ্মীর রূপবর্ণনার পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা বহন করেছেন।

"হেম করিকর ঊরু মনোহর
রতন কদলিকায়।
কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর
অমূল্য অম্বর তায়॥"

এই রূপবর্ণনা কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদ বলে ভুল হয়। আর যখন দেখতে পাই,

"কোটি শশধর বদন সুন্দর
ঈষদ মধুর হাস।
সিন্দুর মার্জিত মুকুতা রঞ্জিত
দশন পাঁতি প্রকাশ॥
সিন্দুর চন্দন ভালে সুশোভন
রবিশশী এক ঠাঁই
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা
ত্রিভুবনে হেন নাই।" — (ভারতচন্দ্র)

এখানে আমরা কেবল কালিদাসের "শিখরীদশনা"কে পাই তা নয়, বিদ্যাপতির—

"সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জন্ম রবিশশী সঙ্গতি ঊয়ল।
পিছে করি আন্ধিয়ার ॥"

প্রভৃতি বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিদ্যার রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র যখন বলেন,

"কি কাজ সিন্দুরে সাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥"

তখন একই উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বিদ্যার রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম অনুসরণ করেছেন। আবার কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী গৌরীর রূপের উপমা দিতে গিয়ে যখন বলেন,

"উরুযুগ করিকর নাভি সে গভীর সর
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ।"

অথবা, "গৌরীর দশন-রুচি দেখিয়া দাড়িম্বৰীচি
মলিন হইলা লজ্জাভরে।"

অথবা, "অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন ।
অতসী-কুসুম তনু ভ্রূযুগ কামের ধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন॥"

তখন বিদ্যাপতির,

"পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সে ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল— কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ॥"

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, বিদ্যাপতি এমন কি মহাকবি কালিদাসেরও উপমার উপকরণের উৎস মূলত এক। বিদগ্ধ কাব্যশিল্পের সাধনার পথের পথিক তাঁরা সকলেই ।

আবার পল্লীকবির রূপবর্ণনায় যখন দেখি—

"আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাইল দেখাছি কলি॥" (মলুয়া)

অথবা "কাকুনি শুপরি গাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে॥
আষাঢ় মাস্যা বাঁশের কেরুল মাটি ফাট্যা উঠে॥
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে হাটে॥" (কমলা)

অথবা "বাহু দু'খান যেন রে তার কচি লাউয়ের ডগা।"

তখন মনে হয় শাস্ত্রবর্ণিত উপকরণের সম্পদের অধিকারী না হলেও নারীর রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি প্রতিদিনের জীবনধারার সঙ্গে বিজড়িত আপন গৃহ প্রাঙ্গনেই তাঁর উপমেয় উপকরণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এখানে কেবল জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির নিবিড় আত্মপ্রকাশ নয়, অতি পরিচিত বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্যের বিস্ময়কর আবিষ্কারও দেখতে পাই।

রূপপ্রতীকের তৃতীয় ধারার স্রষ্টাও পল্লীকবিগণ। এখানে আমরা দেখতে পাব বিদগ্ধ সাহিত্য ও গ্রাম্য সাহিত্য — এই দ্বৈতধারার এক অপূর্ব সম্মেলন। আমার মনে হয়, বৈষ্ণবপদাবলী ও কীর্তন এই দু'টি ধারার মিলনের বাহন। বাঁধ-ভাঙা বন্যাপ্রবাহের মত বৈষ্ণবপদাবলী ও কীর্তনের উচ্ছল তরঙ্গ একদিন আমাদের পল্লীগ্রামের নিভৃত অঙ্গনকেও পরিপ্লুত করেছিল; নিরক্ষর গ্রাম্য কবিগণ পদাবলীর মাধুর্যধারা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তারপর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে পরিচিত জীবনের বস্তুসম্ভার ও পদাবলীবর্ণিত উপকরণ কখন যে কবিকল্পনার স্বর্গলোকে একসঙ্গে মিলে গেছে কবি নিজেও বোধ করি সে সম্পর্কে সচেতন নন। "সুনাই"র যৌবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি প্রথমেই যখন বলেন, "অঙ্গের লাবনি সুনাইর গো বাইয়া পড়ে ভূমে" তখন কি পরিচিত পদাবলী জ্ঞানদাসের — "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়" মনে পড়ে না? এই মিলিত ধারার দৃষ্টান্ত বোধ করি "কঙ্ক ও লীলা"য় লীলার যৌবনবর্ণনায় সব চেয়ে স্পষ্ট।

"পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে যায়
মৈলান হইয়া ফুল পাতাতে লুকায়॥
চান্দ মুখ দেখিয়া চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে।
পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে॥
কি কব সে রূপের কথা কইতে নাহি পারি।
চন্দ্রের সমান রূপ দেখিতে অপ্সরী॥
সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্ম ফুল।
হাটিয়া যাইতে লীলার মাটিতে পরে চুল॥
চাচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে
বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে॥

উপরে যোর ভুরু নীচে নয়ান তারা।
মধু লোভে পুষ্পে যেমন বৈসাছে ভমরা॥ ...
তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিলুর মধ্যে ঢাকা॥
মুষ্টিতে আটয়ে লীলার চিকণ কাকালী।
হাটিয়া যাইতে কন্যার যৈবন পরে ঢলি॥"

একটু দীর্ঘ হলেও সম্মিলিত ধারার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই বর্ণনা উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারিনি। কবির বাক্‌ভঙ্গী ও আঙ্গিক পল্লীসঙ্গীতের হলেও উপমার উপকরণের মধ্যে কি প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র কথিত বস্তুসম্ভার পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে নি? "মুষ্টিতে আটয়ে লীলার চিকণ কাকালী" এই বর্ণনার সময় কবির অবচেতন মনের গহনে কৃত্তিবাসবর্ণিত সীতার রূপবর্ণনার "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালী"র ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট।

রূপপ্রতীকের এই ত্রিপথগা ধারার মধ্যে আমাদের কাব্যসাহিত্যের একটা দিকের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত হতে পারে; কিন্তু ভাষা লোকসাধারণের সাধারণ সম্পদ। এ জন্যে সমাজবিপ্লব বা ধর্মবিপ্লবের পরে ভাষার মৃত্যু হয় না। শব্দের রূপগত বা অর্থগত সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ হতে পারে কিন্তু ভাষার মূল প্রবাহ একই ধারায় বয়ে চলে।